সোনা রঙ বিকেলে

আহমদ মতিউর রহমান

সোনারঙ বিকেলে

আহমদ মতিউর রহমান

www.pathagar.com

সোনারঙ বিকেলে

আহমদ মতিউর রহমান

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

সোনারঙ বিকেলে

আহমদ মতিউর রহমান

প্রকাশক
এস এম রইসউদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম অফিস ঃ
নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩
ঢাকা অফিস
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল ঃ একুশে ফেব্রুয়ারী/২০১০

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

মূল্য ঃ ৯০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা, ফোন ঃ ৯৬৬৩৮৬৩
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোনঃ ৭১৬৩৮৮৫

SONA RANG BIKELE: Written by Ahmed Matiur Rahman, Published by S.M. Raisuddin, Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125, Motijheel Commercial Area, Motijheel, Dhaka-1000 and Niaz Mangil, 922 Jubilee Road, Chittagong-4000
Price : Tk. 90.00 ; US$ 03.00 **ISBN 984-70241-0012-0**

www.pathagar.com

আমার কথা

শিশু-কিশোররা সমাজের চারপাশের নানা জিনিস সম্পর্কে জানতে চায়। তাদের সেই জানার আগ্রহ অনেক খানি মেটায় শিশু সাহিত্য। শিশুরা ছড়া কবিতা পড়তে চায়- গল্প কাহিনী পড়তে চায়। এসবের মধ্য দিয়ে সে চেনা জানা জগৎটাকে নতুন করে বুঝতে শেখে। গল্পের অনেক চরিত্রের সঙ্গে যে নিজের মিল খুঁজে বেড়ায়। ফলে এসবের মধ্য দিয়ে আপন জগৎটাকে সে উপলব্ধি করতে পারে।

শিশু কিশোরদের জন্য এবং তাদেরই কিছু চরিত্র নিয়ে লেখা আমার এ গল্প গুলোতে আমি তাদের চেনা জানা ভুবনকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। গল্পগুলো তাদের ভালো লাগলেই আমার শ্রম সার্থক হবে। গল্পগুলোকে বই আকারে প্রকাশ করায় বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ কে ধন্যবাদ জানাই।

-লেখক

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশের শিশু সাহিত্যের বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে শিশুদের উপযোগী বহু বই প্রকাশ ও বাজারজাত করছে। সেই প্রচেষ্টারই অংশ হিসেবে প্রকাশিত হলো আমাদের নবতর গ্রন্থ আহমদ মতিউর রহমানের শিশু কিশোরদের জন্য লেখা **'সোনারঙ বিকেলে'**।

শিশুদেরকে আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদের হাতে মজার মজার খাবার আর খেলনা তুলে দিলেই হবে না। তুলে দিতে হবে সমাজ-দেশ- জাতিগঠনে সহায়ক বই পুস্তক। এই বই পড়ে সে জানতে পারবে নতুন তথ্য এবং নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে। শিক্ষামূলক বইয়ের পাশাপাশি সৃজনশীল সাহিত্যও তার জন্য প্রয়োজন। ছোটগল্প, রূপকথা, ছড়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সে আবিষ্কার করতে পারবে নিজেকে।

সেই প্রচেষ্টারই অংশ আমাদের সম্প্রতিক শিশু কিশোর প্রকাশনা। আগামী দিনের সৎ, যোগ্য, দেশ প্রেমিক ও আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার জন্যই আমাদের এই প্রয়াস। আশাকরি শিশু-কিশোরদের অপূরণীয় অনেক কিছু পূরণ হবে এবং সোসাইটি লিঃ-এর প্রকাশনার সার্থক হবে।

(এস এম রইসউদ্দিন)
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

উৎসর্গ

মোমিন উদ্দীন খালেদ
শরীফ আবদুল গোফরান

www.pathagar.com

সূচীপত্র

সোনারঙ বিকেলে # ০৯
দোতলা বাস # ১৩
শেষ বিকেলের আনন্দ # ১৮
সেই অদ্ভুত লোকটি # ২২
স্বপ্নের জাহাজে রিংকু # ২৬
সোনালী সকাল # ৩১
রোদ # ৩৮
আবু টিটুর পাখি শিকার # ৪২

www.pathagar.com

সোনারঙ বিকেলে

সোনারঙ বিকেল। রুনুবু বলতো নিকেল করা বিকেল। রুনুবুর তখন বিয়ে হয়নি, ক্লাস টেনের ছাত্রী। নিকেল করা বিকেলটাতে প্রতিদিন রাজ্যির বন্ধু এসে আমাদের খোলা ছাদে জড়ো করতো। পরীর মতো মেয়েগুলো শুধু রুনুবুর কথা শুনে যেতো। যেনো রুনুবুর কথা শোনার জন্যই ওদের জন্ম। খেলতে এসে একটি মেয়ে একটু দুষ্টুমী করে রুনুবুর কথা না শুনেছে কি একদম ভাগিয়ে দিতো নিচে। আর কোনদিন খেলতেও নেবে না জানিয়ে দিতো সাথে সাথে। সুতরাং কে আবার মিছেমিছি দুষ্টুমির জন্য একঘরে হয়ে বসে থাকে? তাই সামান্য বকাঝকা সহ্য করেও ওরা আসতো প্রতিদিন। ওরা যখন কলের পুতুলের মতো রুনুবুর কথা শুনে যেতো, তখন আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে হতো ওদের কানে কানে বলে দেই- তোমরা কেউ রুনুবুর কথা শুনো না, এসে পড়ো আমাদের সাথে খেলবে।

রুনুবুর আসরে প্রতিদিন কতো রাজ্যের গল্প হতো। আমরা যখন এক পাশে দাঁড়িয়ে ওদের গল্প আড়ি পেতে শুনতে চাইতাম, বুবু তখন আমাদের চুল ধরে হিড় হিড় করে টেনে রেল সড়কের ওপারের বালুর মাঠ দেখিয়ে দিয়ে বলতোঃ ছেলেরা ওখানে, অই মাঠে খেলতে যায়, এখানে নয়। মেয়েগুলো শুধু হাসতো তখন। আমার খুব রাগ হতো ইচ্ছে হতো রুনু বুর পিঠে কষে কিল-ঘুষি লাগাই। নয়তো দরজায় আড়াআড়ি করে লাগানোর মোটা ডান্ডাটা এনে বুবুর খেলাঘর তছনছ করে দেই। না হয় ঐ হাসুনে মেয়েগুলোর মাথা গুলতির আঘাতে জখম করে দেই যাতে তারা আর কোনদিন না আসতে পারে।

www.pathagar.com

রুনুবুর হাসি হাসি মুখ আর এক বুক ভালোবাসা পলকে আমার সমস্ত রাগ আর বাজে কল্পনাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দূরে সরিয়ে দিতো। বেণী দোলানে নীনু, বাবলী। ওদেরও কোন দিন চিমটি পর্যন্ত কাটতে পারিনি। এখনো প্রতিদিন সোনা রঙ বিকেল নামে। সেই রুনুবুর নিকেল করা বিকেল। কিন্তু আজ এখানে রুনুবু নেই। নীনু, বাবলী, বীথি, পলিরাও আর খেলতে আসে না। বিকেলটা আগের মতো রঙে রসে সাজে না, কাঁদে। ঝর ঝর কান্নার শব্দ প্রতিদিন আমাকে জব্দ করে। আমি কখনো গোপনে বুক ভাসিয়ে কাঁদি, কখনো মনের ভেতর কান্নার রিনরিনে একটা ব্যথা অনুভব করি।

একদিন ছোট মামা দেখতে শুনতে মানানসই গোছের একজন অচেনা লোককে নিয়ে এলেন বাসায়। নতুন ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন। অচেনা লোকটাকে সেকি আদর বাবা-মার। আমি আগে কোনদিন দেখেছি বলে মনে পড়লো না। ঝুনু আপা তার বাচ্চা রিংকুকে নিয়ে তখন আমাদের বাসায়। অচেনা লোকটাকে দেখিয়ে দিয়ে বুবু বলেছিলেন, আমাদের হবু দুলাভাই, মানে রুনুর বর। সেদিন অতোটা বুঝিনি। বুঝলাম ক'দিন পর যখন সেই লোকটা রুনুবুকে ভোজবাজীর মতো পঙ্খীরাজে চড়িয়ে সুদূর চাটগাঁ পাড়ি দিলো।

বিদায়ের দিন বাবা পাংশু মুখে বসেছিলেন। মা ঘন ঘন চোখে আঁচলের কোনে চাপ দিচ্ছিলেন। কোন উৎসব নেই, আয়োজন নেই। শুধু বর পক্ষের আট-দশজন লোক এসেছিলেন। আমার সেদিন দারুণ একা একা লাগছিলো। কান্না পেয়েছিলো। ইচ্ছে হয়েছিলো সাত-আট দিন এক নাগাড়ে কাঁদি। রুনুবুও কান্না রাখতে পারেনি। শুধু যাবার সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলেছিলো, আমি কেমন করে থাকবো?

রুনুবু সেবার মেট্রিক দিয়েছে মাত্র। ছোটবেলা থেকেই গাছ লাগানো, বাগান করা ছিলো আমার এক ধরনের ভালো লাগা। বুবু যখন ছিলো কত ফুলের চারা এনে দু'জন ছোট বাগানটাকে তৈরী করেছিলাম। আজ সেদিকে তাকালে বুকটা হঠাৎ ছাঁৎ করে উঠে। ছোটবুর অভাব তখন সবচেয়ে বেশী মনে হয়। বলতে ইচ্ছে করে, রুনুবু তুমি নেই, বাগানে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

যেতে ইচ্ছে করে না, বাগানে ফুল নেই। বিকেলগুলো আজ আর যেনো নিকেল করা নয়।

হলুদ রোদ পশ্চিমের দেয়ালে ছোপ ছোপ কলাবতীর মতো ছবি আঁকে। রেল সড়কের পাশে বালুর মাঠে তখন ছেলেদের হৈহৈ খেলা। একঝাঁক পাখি উড়ে যায় দূরের আকাশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে। আমারও ইচ্ছে করে সাগরের বেলাভুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চাটগাঁয়ে পৌছে যাই। কোথায় আমার রুনুবু। ইচ্ছে করে পাখিদের ডেকে বলি, তোমাদের খেলার অনেক সঙ্গী আছে, তোমাদের অনেক বড়ো আকাশ। হায় পাখি আমার কেন সঙ্গী নেই, নেই কোন আকাশ। শুধু একজোড়া চোখের জলের নদী আছে। ঝাপসা চোখে এখন ভয়ানক অসুখ আমার। নিকেল করা বিকেল আমার কাছে এখন পলেস্তা খসে পড়া বাড়ির মতো বিচ্ছিরি। এই তো আকাশ কতো উদার। নদী কতো উচ্ছল। কই আমি তো চঞ্চল হতে পারি না। সারু, সেলিম, মিলন ওরাও বিকেল হলে আমাকে ডাকতে আসে না। আমি খেলতে যাই না। বসে বসে শুধু আকাশের উদারতা অসীমতা দেখি। এক্সিডেন্টে আমি পা হারাতে পারি। তাই বলে আমি তো আমার পুরো সত্ত্বাকে হারিয়ে ফেলিনি। আমারও তো মন আছে, আমি ভাবতে পারি, অনুভব করতে পারি, রুনুবুর এমন একটা মন ছিলো। আমারও তো একজোড়া চোখ আছে, দেখতে পারি। রুনুবুর যে রকম ছিলো। আমি এখনো চোখ বুজলে দেখতে পারি রুনুবুর চোখে অনেক স্নেহ অনেক মায়া।

এখন ক্রমশঃ বিকেল তার সৌন্দর্য হারাচ্ছে। একটু পরেই অন্ধকার সারা শহরটায় ঘাপটি মেরে বসবে। বালুর মাঠের ছেলের দল এক্ষুণি বাড়ী ফিরবে। সমস্ত পাখি আপন আপন বাসায় ফিরে যাবে। আমি আসছে শীতে চাটগাঁ যাবো। রুনুবু চিঠি দিয়েছে, আমায় এসে নিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

দোতলা বাস

শামীমদের বাসার সামনে দুপুর থেকে একটা দোতলা বাস দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিদিন ঘর-ঘর-ঘর-ঘর আর প্যাঁ-পো করে কত গাড়ি-ঘোড়া আসে-যায় এ রাস্তাটা দিয়ে। রাস্তাটা খুবই ব্যস্ত।

শামীমদের বাসা থেকে রাস্তার গাড়ি-ঘোড়ার যাতায়াত স্পষ্ট দেখা যায়। সে বারান্দায় বসে, ছাদে দাঁড়িয়ে প্রতিদিনই দ্যাখে।

দূরের গোল চক্করটা ঘুরে রোহনদের লাল রঙের গাড়িটার মতো অন্যসব গাড়ি মেইন রোডের দিকে যখন ছুটে যায় তখন দেখতে খুবই ভালো লাগে। একেকটি গাড়ি বাঁক ঘুরে একেক দিকে শো-ও-ও-দৌড় দিচ্ছে। দেখতে মনে হয় সমস্তটা পৃথিবী ঘুরছে-নয়তো শামীমসহ তাদের দোতলা বাড়িটা ঘুরছে। এসব প্রতিদিন সকাল-দুপুর বিকেল-সন্ধ্যায় দ্যাখে শামীম। শুধু রাত ছাড়া। রাতে ছাদে যেতে আম্মু বারণ করেছেন। বারান্দা-টারান্দায় অবশ্য যাওয়া যায় এক-আধটু। বারান্দায় লোহার গ্রিল আছে কি না তাই।

এসব গাড়ী-ঘোড়ার দৌড়াদৌড়ি ও প্রতিদিনই দ্যাখে। আশ্চর্য একদিনও খারাপ লাগে না, বিরক্তি ধরে না, কেন এমন হয় ও বুঝতে পারে না। মনটা ওর শুধু রাস্তাটাতেই পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে গাড়ি-টাড়ি চড়ে দূরে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

বারান্দা থেকে সেই দুপুরে ও দেখেছে বাসটা এসে থেমে গেল। তারপর লোকজন সব নেমে গেল এক এক করে। ও বুঝল বাসটা নষ্ট হয়ে গেছে, আর যাবে না।

www.pathagar.com

মাঝে মাঝে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে গাড়ি-ঘোড়া দেখতে দেখতে ওর মনে হয় ওদের দোতলা দালানটাও একটা দোতলা বাস। ঘের ঘের পোও---- ও করে করে চলছে। এক্ষুণি কনডাক্টর আর হেলপারের চিল্লানী শোনা যাবে আজিমপুর, নিউমার্কেট, আসাদগেট, মীরপুর ----।

শামীম ভাবছে বাড়ীটা দোতলা বাস হয়ে গেলে মন্দ হতো না। ও নিজেই যদি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারতো তাহলে একেবারে ডাইরেক্ট মীরপুরে নিয়ে যেত, কোন যায়গায় না থামিয়ে। চিড়িয়াখানা দেখা শেষ করে আবার ছুট লাগাতো সাভারের দিকে। নির্জন রাস্তা ধরে চলতে চলতে দুধারের ধান ক্ষেত দেখত, শালগজারির বন দেখত আর দেখত আকাশ এবং নদী; খোলামেলা আকাশ আর বয়ে চলা হুলাৎ ছলাৎ নদী দেখে ওর নিশ্চয়ই দারুণ মজা লাগত।

দোতলা বাসটা রাজি হলে ওটাকে নদীতে নামিয়ে বিশাল ইস্টিমারের সঙ্গে পালা দিত সে। তখন সে আর শামীম থাকতো না হয়ে যেতো ক্যাপ্টেন শামীম।

মস্ত ঢেউ ঢেউ নদী আর সাগর পাড়ি দিয়ে শামীম সব শেষে এক নতুন রাজ্যে চলে যেত। যেখানে দিনভর প্রাণ জুড়ানো বাতাস খেলে, গাছে গাছে পাখী চিল্লাপাল্লা জুড়ে দেয় আর বাতাসে পাতায় পাতায় শির শির কাঁপন ওঠে। মানুষ সুখে থাকে, আরামে থাকে। সেখানে চোর নেই, দস্যু কিংবা লুটেরা নেই, মুনাফাখোর নেই। মিথ্যা কোন কাজ-কারবারই নেই। সেই দেশ সত্য ও সুন্দরের এক সোনালী পৃথিবী।

এখন আস্তে আস্তে দুপুর পালাচ্ছে। দুপুরের আগে একটুখানি বৃষ্টি নেমেছিল। চারধারের পরিবেশ তাই পরিচ্ছন্ন ছিমছাম।

এখন আম্মুর কথামত ঘুমাবে কিনা শামীম ঠিক করতে পারলো না। বিছানায় গিয়ে শুয়ে বারবার রোহন তার জর্জের কথা মনে হতে লাগলো। ওদের সঙ্গে নিয়ে রাস্তার ঐ পাড়ে বাসটার কাছে একবার গেলে হতো না। কতক্ষণ পর শামীম দেখলো জর্জ রোহনসহ ওরা কয়েকজন একটা বাসের ভেতর বসে আছে।

শামীম চেচিয়ে ওঠে এক সময়-আরে আরে এইটাইতো দুপুর থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রোহন বললোঃ একদম খালির-প্যাসেঞ্জার নেই। ততক্ষণে তড়তড়িয়ে দোতলায় উঠলো জর্জ। বললো ঃ শামীম, দোতলায়ও কেউ নেই, উঠে আয়। শামীম রোহনসহ সবাই দোতলায় উঠল।

যাক ভালোই হলো। একটু পর বললো শামীম।

এরপর অনেকক্ষণ বাসটির ওপর-নীচ চষে বেড়াল ওরা।

একটু পর ড্রাইভারের সিটে বসতে বসতে শামীম বললো-আমি হলাম গিয়ে ড্রাইভার। তোরা কে কি হবি বল। রোহন আর জর্জ কি আর করে-শেষমেষ দু'জন দু'দরজার কনডাক্টর হলো।

দেখতে দেখতে পাড়ার চেনা-অচেনা অনেক ছেলে-মেয়ে এসে বাসে উঠল। মেয়েরা তাদের নির্ধারিত সিটে গিয়ে বসলো। এক সময় বাস বোঝাই হয়ে গেলো। রোহন প্রথম দরজা থেকে হাঁক ছাড়লো-আজিমপুর, নিউমার্কেট, আসাদ গেট, মীরপুর। দেখা দেখি জর্জও।

সেলিনা আপুর সঙ্গে গতকাল কি নিয়ে যেন ঝগড়া হয়েছিল শামীমের। দেখা গেল খেলনার বাক্স হাতে করে সে দৌড়ে আসছে বাসের দিকে। বাসে উঠতে যেতেই রোহন বাধা দিল-লেডিজ সিট নেই। উঠবেন না, পরের বাসে আসেন। তারপর সে কষে দুই থাপ্পর মারলো বাসের গায়ে। বাস চলতে শুরু করলো।

সেলিনা আপু মখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে রইল পরের বাসের অপেক্ষায়।

বাস চলছে রাস্তা কেটে কেটে। শামীম চালিয়ে নিচ্ছে।

বাসটির গতি ক্রমশ বেড়ে চললো। একসময় শামীমের মনে হলো পুরো দোতলা বাসটি এইমাত্র একটা অ্যারোপ্লেন হয়ে গেছে। আর সেও ঠিক ড্রাইভার নয়, একদম পাইলট বনে গেছে। কি আশ্চর্য!

কয়েক মিনিট পর শামীম একটি বিশাল কি যেন আসতে দেখলো বিপরীত দিক থেকে। সেটি কি জিনিস ও বুঝতে পারলো না। একটু পর যুদ্ধের বিশাল ট্যাংক-ফ্যাংক মনে হলো। না ট্যাংকও নয় ওপর দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

সেই অদ্ভুত জিনিসটি দ্রুত এগিয়ে আসছে? ওর মনে হলো যে কোন মুহূর্তে ওদেরটাকে সেই অদ্ভুত যানটি একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়ে যেতে পারে।

www.pathagar.com

শামীম চোখে অন্ধকার দেখলো। রোহন, জর্জ কাউকে আশপাশে দেখা যাচ্ছে না। কোন প্যাসেঞ্জারও নজরে পড়লো না ওর। ও একা স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে এগুচ্ছে। ওর নিজের যানটি কি দোতলা বাস না অ্যারোপ্লেন এখনও ঠিক বুঝতে পারছে না। অন্যদিকে অদ্ভূত যানটি আরো দ্রুত এগুচ্ছে। সব কিছুর তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে ওর। ও কি করবে ভেবে পেলো না।

এক সময় বিকট আওয়াজ উঠল। বিশাল অদ্ভুত যানটি মনে হলো শামীমদের যানটিকে চাপা দিয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছে। শেষ রক্ষা করতে পারলো না শামীম।

বিছানা থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে শামীম চোখ মুখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসল। গায়েও একটু একটু ব্যথা অনুভব করলো সে। বাস অ্যারোপ্লেন, অদ্ভূত গাড়ী কিছুই সামনে নেই, শামীম দেখলো সে মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে আছে। পুবের জানালার ফাঁক দিয়ে বাতাস আসছে, বড় রাস্তার গাড়ী-ঘোড়া দেখা যাচ্ছে। দোতলা বাসটি দুপুরে যেখানে ছিল এখন আর নেই। মসজিদ থেকে আজান ভেসে আসছে। এখন আসর না মাগরেবের নামায হবে শামীম বুঝতে পারলো না।

www.pathagar.com

শেষ বিকেলের আনন্দ

আজ নিয়ে তালহা মোট মাট তিনদিন রোজা রাখল। রোজা রাখতে ওর মোটেও কষ্ট হয়নি। তবু আম্মু কেন প্রতি দিন রোজা রাখতে দেয় না ও ভেবে পায় না। সে জন্য আম্মুর ওপর সামান্য অভিমান হয় ওর।

আম্মু তালহাকে সরাসরি রোজা রাখতে নিষেধ করেন। আম্মু বলেন- এতটুকু মানুষের রোজা রাখতে বলেননি আল্লাহ। তুমি আরো বড় হলে রেখো। তালহা শুনে মুখ গোমড়া করে রাখে। কিছু বলতে গিয়েও বলে না।

আসলেই ওর রোজা রাখতে তেমন কষ্ট হয়নি গত কয়েক দিনে। একদিন শুধু দুপুর বেলা খাবার ঘরে এক পাক ঘুরে যেতে পেটে ক্ষিদে মোচড় দিয়ে উঠেছিল। রোজা রেখেছে মনে হতেই দুপুর বেলা আর শোবার ঘর থেকে ওদিকে যায়নি। গেলে হয়তো একটু পানি খেতে ইচ্ছে করতো।

শামীমের চেয়ে পেছনে পড়ে যাওয়ার তালহার খুব খারাপ লাগছিল আজ।

শামীম গতকাল বলেছিল-আমার আজ নিয়ে পাঁচটা হলো। তোর?

তালহা কোন জবাব দেয়নি প্রথমে। তারপর একটু পরে বলেছিল-মাত্র দু'টা।

এই 'মাত্র দুটো' বলতে ওর নিজেকে অনেক অপরাধী আর লজ্জিত মনে হয়েছিলো। ও মনে মনে ভাবছিলো, না, আম্মুকে নিয়ে পারা গেল না। শামীম ছেলেটা কিনা শেষ মেষ আমাকে হারিয়ে দিল?

শামীমের সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বলতে পারেনি তালহা। নিজেকে ওর শুধুই দুর্বল মনে হয়েছিল।

www.pathagar.com

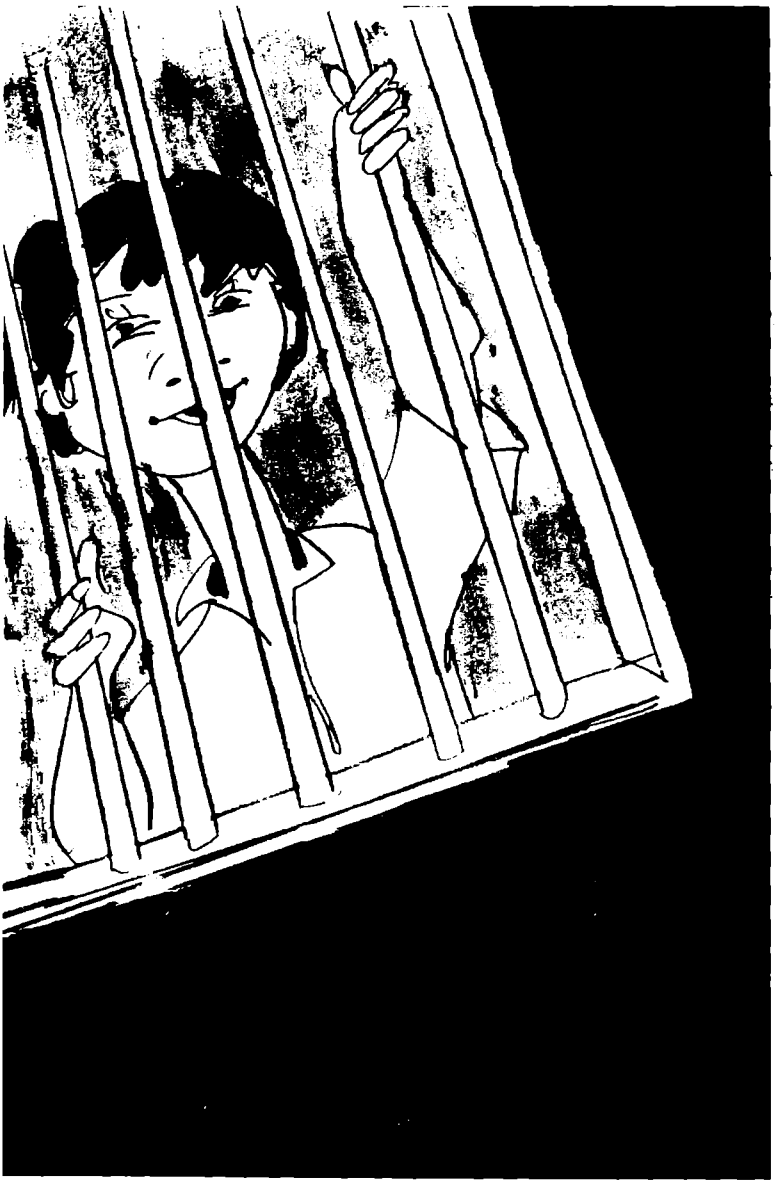

www.pathagar.com

শামীম যখন গতকাল এ ব্যাপারে আলাপ করছিল ওর চোখে মুখে ছিল দীপ্তি। সে দীপ্তি তৃপ্তির। আর আনন্দের। রোজার কষ্ট তাতে একটুও লক্ষ্য করা যায়নি।

ক্লাসে কোনদিন তালহাকে হারাতে পারে না, ডিঙাতে পারে না শামীম। আজ পারলো। একথা ভেবে তালহার তখন মরে যেতে ইচ্ছে করছিল।

আজ সারাদিন তালহা অনেক কিছু ভাবলো। ভাবতে ভাবতে আম্মুর ওপর ওর রাগটা বেড়ে গেল। তারপর সে রাগ রূপ নিল প্রতিজ্ঞায়। আজ রোজার দশ। ও মনে মনে ঠিক করলো বাকী দিনগুলোতে রোজা রেখে যে করেই হোক শামীমকে হারাতে হবে।

ভোর রাতে খাবার সময়ও আম্মু তালহাকে জাগাতে চান না। শত নিষেধ সত্ত্বেও আব্বু দু'দিন জাগিয়ে ছিলেন। তালহা লক্ষ্য করেছে- আম্মু যেন তাতে খানিকটা রাগ হয়েছে আব্বুর ওপর। অবশ্য কিছু বলেনিও। আর গত রাতে খাবার-দাবারের টুংটাং শব্দে ও জেগে গিয়েছিল।

দুপুরে নামাযের সময়ে আম্মুমনি তালহাকে রোজা ভেঙ্গে ফেলার জন্য বলেছিলেন। তালহা শুনে বলেছে, আমার ক্ষিদে পায়নি, আমি রোজা রাখব। তিনি তার পর কয়েকবার পীড়াপীড়ি করেছেন। তালহা তবু কিছু মুখে তোলেনি।

এখন ঠিক তিনটা বাজলো। বাইরে রোদে বেশ তাপ। বাতাসে কোন আরাম নেই। ফ্যানের বাতাসেও কারা যেন আগুনের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে।

বিছানায় কতক্ষণ গড়িয়ে তালহা একসময় পূবের জানালায় দাঁড়ালো। একটু আগে বেশ পিপাসা পেয়েছিল। এখন তা আর নেই। দূরে রাস্তায় তেমন লোক চলাচল নেই। শুধু ছাড়াবাড়ির মাঠে ইদ্রিসের বাপের কালো গাইটা ঘাস চিবুচ্ছে। তালহা দেখল।

পাশের ঘরে আম্মুর মিহি সুরে কোরআন তেলাওয়াত একটু আগে শেষ হয়েছে। আব্বু অফিস থেকে ফিরে এই মাত্র বাজারে গেলেন। তালহার মনে হতে থাকে বিশ্রী দুপুরটা যেন ঘাপ্টি মেরে বসে আছে, একদম যাচ্ছে না।

www.pathagar.com

তালহা জানলা থেকে ঘরে এসে আজম মামার দেয়া ছবির বইটা খুলে বসে। ছবিগুলো দেখে তালহার ভালো লাগলো। ও অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে উল্টে-পাল্টে বইটা দেখে।

দেখতে দেখতে এক সময় বিশ্রী দুপরটা ওর সামনে থেকে সরে যায়; নেমে আসে এক প্রশান্ত বিকেল। রোদের তেজ ক্রমশঃ কমে আসে।

বিকেলে শামীমকে সঙ্গে করে সারোয়ার ভাই আসেন। তালহা ব্যস্ত হয়ে পড়ে-আরে সারোয়ার ভাই, সারোয়ার ভাই। আসেন, বসেন।

সারোয়ার ভাই হাসিমাখা মুখ নিয়ে বলেন, চল তালহা চাষাড়া থেকে ঘুরে হাওয়া খেয়ে আসি।

এই বিকেলে বাইরে --? তালহা বলে!

ও রোজা রেখেছে সরোয়ার ভাই বুঝতে পারেন। হেসে বলেন, --- ভয় নেই হাওয়া খেলে রোজা ভাঙেনা, চল যাই।

চাষাড়ার বালুর মাঠ আর রেল লাইনের ধার ঘেঁষে ঘুরা ফিরা শেষে ইফতারের আগেই বাসার দিকে ফিরতে থাকে ওরা। শামীমের সাথে টুকটাক কথা হয়। দু'জনে সারোয়ার ভাইর পাশাপাশি রাস্তা ধরে চলতে থাকে। তালহার এখন মনে হয় না শামীম ওকে ছাড়িয়ে গিয়ে বাহবা কুড়াতে পারবে। ওর মনে হয় শামীমকে ইচ্ছে করলেই ও পেছনে ফেলে দিতে পারবে। সারাদিন রোজা রাখার পর শেষ বিকেলেও ওর সামান্য আনন্দ হয়।

www.pathagar.com

সেই অদ্ভুত লোকটি

একে একে তিন দিন তালহা লোকটাকে দেখলো। লম্বাই চওড়াই এ লোকটার পরনে একটা তালি মারা জামা আর একটা ঢিলেঢালা পাজামা। কাঁধে ঝুলি হাতে ডুগডুগি। লোকটাকে বরাবরই অদ্ভুত মনে হতো ওর। ডুগডুগিতে বাড়ি মারতেই প্রথম দিন পাড়ার অনেক ছেলে বড় রাস্তার দিকে দৌড়ে গিয়েছিলো। দৌড়াতে গিয়ে তালহা পড়ে গিয়ে একটা চোট পেয়েছিলো।

লোকটা অনেক খেলা জানে। একটা খেলা দেখায় আর বলে- বাচ্চা পোলাপান জোর কইরা একখান তালি বাজাও। জোরে আরো জোরে। হুররে.....

সেদিন অনেকগুলো খেলা দেখার পর কি আশ্চর্য পায়ে লাগা ব্যথাটা তালহা আর অনুভব করেনি। তালি বাজাতে গিয়ে হাত লাল করে ফেলেছিলো। ও এরপর আজম মামার সাথে চাষাড়ার মোড়ে হাঁটতে গিয়ে আর একদিন দেখলো লোকটাকে। খুব ভীড়। একদম ঢোকাই যাচ্ছিলো না। অনেক ঠেলে ঠুলে আজম মামা ওর জন্য এক টুকরো ফাঁক রেখেছিলেন। তালহা দেখলো লোকটাকে। হ্যাঁ, এই লোকটাই সেদিন খেলা দেখাচ্ছিলো। সেই একই পোশাক। কাঁধের ঝুলিটা মাটিতে এপাশে আশ্রয় নিয়েছে। লোকটা খেলা দেখিয়ে চলেছে সমানে। সেদিন খেলা দেখানোর সময় হাতে যে লাঠিটা ছিলো আজো তা যথাযথই হাতে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তালহা অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে আছে। কত যায়গা থেকে না লোকটা পয়সা বের করলো। কি আশ্চর্য! কোথাও একটু হাত দিতেই হুড়মুড়িয়ে লাফিয়ে হাতে আসে চকচকে একটা আধুলী। ও এমন খেলা কোনদিন দেখেনি আর।

লোকটা অনেক খেলা দেখালো আজো। মাঝে কয়েক বার সেই দিনকার মতো করে বললো, বাচ্চা পোলাপান জোর কইরা একখান তালি বাজাও। জোরে আরো জোরে, হুররে।

তালহাও তালি বাজালো। অনেক ছেলে হুররে বলে মাঠটা করতালির বাজনাতে মুখর করে তুললো।

একসময় লোকটা ঝোলা থেকে কিসব ওষুধ বের করলো। কেউ কেউ কিনতে যেয়ে হুড়োহুড়ি শুরু করলো। কেউ ভিড় সরিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললো, খেলা শেষ। তালহাও বুঝলো আর খেলা হবে না। সেও আজম আমার হাত ধরে বেরিয়ে এলো।

বাইরে বেরিয়ে তারা দেখলো, বিকেলটা মরে এসেছে, সন্ধ্যার বেশি বাকি নেই। রিকশায় টুংটাং শুনতে শুনতে এগুলো। এসময়ে এদিকটায় অনেক লোক হাওয়া খেতে আসে। রাস্তার বাতিগুলো পট পট জ্বলে উঠে স্থির আলো দিতে শুরু করলো এক সময়। তার মানে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এক্ষুণি মসজিদে মসজিদে আযান হবে। আজম মামা তালহার হাত ধরে দ্রুত বাসায় দিকে পা বাড়ালেন।

সেই অদ্ভুত লোকটাকে কেনো জানি ভালো লেগে গিয়েছিলো তালহার। আজম মামা বলেছিলেন, এদের বলে যাদুকর। তালহার ইচ্ছে হয় প্রতিদিন যাদুকরের খেলা দেখতে। আহা লোকটা যদি বছর ধরে এখানে খেলা দেখাতো। হ্যাঁ, আম্মু মানা না করলে ও প্রতিদিনই যেতো। আর আম্মু মানা করবেন কেনো? ও ভেবে পায় না। ওর আব্বুমনি এতো বেশী সময় বাইরে থাকেন যে মাঝে মাঝে ওর রাগ হয় আব্বুমনির উপর। আব্বুমনি রোগ্ রোজ এক গাদা চকলেট আনেন। চকলেট হাতে পেলে কি আর রাগ থাকে? আব্বুমনিকেও ওর কম ভালো লাগে কিনা ও ভেবে পায় না।

www.pathagar.com

অন্যান্য দিনের মতো আজো আজম মামার সঙ্গে বেরুচ্ছিলো তালহা। বাসা থেকে বেরিয়ে হাসপাতালের সামনে আসতেই দেখলো একটা লোককে কয়েকজনে মিলে ধরাধরি করে হাসপাতালের ভেতরে নিচ্ছে। এক পাশে একটু কাত হয়ে থাকা লোকটার মুখ দেখে তালহা চমকে উঠলো। এযে সেই লোকটা! তার এ অবস্থা হলো কি করে?

লোকটার পরনে সেই জামা আর পাজামা। শুধু ঝুলি লাঠি আর ডুগডুগি সাথে নেই। লোকটার কি হয়েছে জানতে পারলো না ওরা। লোকটার জন্য দুঃখ হলো ওর। মনটা খারাপ হয়ে গেলো একদম। আজ আর হাঁটতে যাবে না ঠিক করে আজম মামাসহ বাসার দিকে ফিরে চললো। যেতে যেতে মনে মনে ঠিক করলো লোকটার জন্য অনেক দোয়া করবে সে। যাতে লোকটা ভালো হয়ে যায়। আম্মু বলেছেন, কেউ অসুখে পড়লে দোয়া করতে হয়। লোকটাকে আর কোনদিন দেখতে পায়নি তালহা। ও বলতে পারে না লোকটা বেঁচে আছে, না মরে গেছে।

www.pathagar.com

স্বপ্নের জাহাজে রিংকু

দু'দিন স্কুলে গেল না রিংকু। আজও সে স্কুলে যেতে পারলো না বলে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

অসুখ বাধিয়ে বিছানায় পড়ে থাকা রিংকুর অসহ্য মনে হয়। মাঝে মাঝে ভাবে অসুখে পড়লে কোনদিন ভালো হবে না সে। হারিয়ে যাবে, আজম মামার মতো। হঠাৎ করেই শুনেছিল আজম মামার ক্যান্সার হয়েছে। দেখতে দেখতে রিংকুর আম্মার মুখের হাসি কোথায় যেন হারিয়ে গেল। পিংকু, বড় আপা ও আব্বু মনির ও থমথমে মুখ। রিংকুর তখন দারুণ কান্না পেতো। দু'তিন রাত বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদেছে সে। তবুও আজম মামা একদিন মরে গেলেন। রিংকুর এখন মনে হয় আজম মামা ওর অনেক প্রিয় আর আপন ছিল।

আজম মামাকে খুব বেশি করে মনে পড়ছে। মনে হয় সেও আজম মামার মতো হারিয়ে যাবে। হ্যাঁ সে রকমই মনে হয়। আরো মনে হয় কেউ তাকে আটকে রাখতে পারবে না। কেউ না। আম্মা কি পারবে? সন্দেহ হয় রিংকুর। তবে আম্মাকে ছেড়ে যেতে ভীষণ খারাপ লাগবে ওর।

একটু একটু করে রোদ চড়ছে। পূবের জানালা গলিয়ে আসা রোদ এই মাত্র উঠে গেল। জানলা থেকে সরে এসে বিছানায় পিঠ ঠেকালো রিংকু। মাথাটা ভারি হয়ে আছে। গায়ে যেন একটুও শক্তি নেই। আবার জানালায় দাঁড়ায় রিংকু। জানালার দাঁড়িয়ে যখন দুটো চড়ুইয়ের নাছানাচি দেখছিল তখন একবার মনে হয়েছিল দশতলা দালানের ছাদ থেকে মুহূর্তেই পড়ে যাবে ও। কখন যে সাদা দশতলা দালানটির ছাদে উঠে এসেছে বুঝতেই পারেনি। আরে চড়ুই দুটো গেল কোথায়? ইদ্রিসের বাপের কালো গাইটাও যে নেই! দু'তিনটা ফড়িং বসেছিল গাইটার পিঠে, ওরাও উধাও।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অন্য কিছু ভাবার আগেই দূরের আকাশ দেখলো রিংকু। দেখলো ফড়িং কটি এই মাত্র উড়ে গেলো। চড়ুই দুটো কোথায় গেল বুঝতে পারে না রিংকু।

আবার মনে হলো সারা আকাশ কালো হয়ে আসছে। ইদ্রিসের বাপের কালো গাইটাকে আবার দেখলো রিংকু। পালাচ্ছে, ল্যাজ তুলে। গোটা পৃথিবী যেন দুলছে। দশতলা দালানটাও দুলছে। দোল দোল দোলানী, রাঙা মাথায় চিরুনী- ছড়া কাটতে ইচ্ছে হচ্ছে রিংকুর। একবার মনে হলো কে যেন পুরো দশতলা দালানটা দোলনার উপর বসিয়ে দিয়েছে। আবার মনে হলো, না, দশতলা দালানটা যেন রশিদ মিয়ার দোকানে সুতোয় ঝুলিয়ে দেয়া মস্ত ক্যাপস্টানের প্যাকেট। ফ্যানের বাতাসে শুধু এপাশ ওপাশ দোল খাচ্ছে। রশিদ মিয়া রোজকার মতো তাড়াহুড়ো করে দোকানের ঝাপ বন্ধ করছে না দেখে অবাক হয় রিংকু।

রশিদ মিয়া হাসছে, শুধু হাসছে আর তুফানের তান্ডব দেখছে। আরে রশিদ মিয়া পাগল হয়ে গেল নাকি? সব কিছুতো উড়িয়ে নিয়ে যাবে! ক্যাপস্টানের মস্ত প্যাকেটটা তখনও দুলছে। রিংকুর ইচ্ছে হলো, রশিদ মিয়াকে চেঁচিয়ে ডেকে বলে তুফান এসেছে, জলদি দোকান বন্ধ করেন।

কিছু বলার আগেই ও দেখলো দশতলা দালানটা যেন জাহাজের মতো পানিতে ভাসছে। রিংকু নিজে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, ভাবতে পারলো না। কি মজা! রিংকু নিজেই গাইটার পিঠে চড়ে বসেছে। কিন্তু গাইটা দৌড়ে পালাচ্ছে না। গাইটার এক শিঙে একটা ফড়িং আর অন্য শিঙে একটা চড়ুই। রিংকু দারুণ অবাক হলো। ফড়িং আর চড়ুই দুটো যাচ্ছে না।

জাহাজটা কখন যে দূরে মিলিয়ে গেছে দেখতে পেল না রিংকু। কিছুক্ষণ শুধু আকাশ দেখলো। কখন যে কালো গাইটা ওকে ঘরে জানলার পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল রিংকু বুঝতেই পারেনি।

রিংকুর মা মনি ঘরে এলেন। হাত রাখলেন কপালে। গা বেশ গরম।

রিংকু চোখ বুঁজে পড়েছিল। আম্মার হাতের ছোঁয়ায় চোখ মেলে তাকালো। মামনি জিজ্ঞেস করলেন- আববুমনি, গরম দুধু এনে দিই, একটু পাঁউরুটি খাবে?

www.pathagar.com

রিংকুর পাঁউরুটি-টাউরুটি খেতে মোটেই ইচ্ছে করছিল না। পাউরুটি দেখলেই ওর মনে হয় ওতো পথ্য, রোগীরা খায়। একটু চুপ মেরে থেকে বললঃআম্মা, আমি কিসসু খাব না, আমের আচার আর ডাল দিয়ে গরম ভাত খাবো শুধু।

মা মনি বললেন সে কি, জ্বরের মধ্যে কি কেউ ভাত খায়? ভাত খেলে যে জ্বর সারতে দেরি হয়। রিংকুর মনে হলো, ওর অসুখ তো সারবেই না, ভাত খেলে কি আর হবে। বললো-এখন কিছু খাবো না, ক্ষিদে নেই।

চুপচাপ কাটলো কিছুক্ষণ।

কপালের চুলগুলো ঠিক করতে করতে মা মনি বললেন-রিংকু তোর বড় মামা আসবে বিকেলে।

রিংকু সামান্য হাসলো।

আড় মোড়া ভেঙে উঠে বসলো। বললো- বড় মামা খুব ভাল, তাই না!

হু। মামনি সামান্য হেসে জবাব দিলেন। মামনি বললেনঃ তুই শুয়ে থাক, আমি একটু রান্না ঘরে যাই ...।

আচ্ছা। জবাব দিল রিংকু।

পিংকু, বড় আপু-আব্বু কেউ নেই বাসায়। একেবারেই খালি। আস্তে আস্তে দুপুর হচ্ছে। বাইরে রোদের তাপ বাড়ছে।

রিংকু শুয়ে শুয়ে এবার স্কুলের কথা ভাবলো। মনে হলো ওর অসুখ আর সারবে না। স্কুলে যেতে পারবে না কোনদিন। চানমারির টিলার কাছাকাছি গুলতি দিয়ে চড়ুই শিকার বন্ধ হয়ে যাবে। বিকেলে পার্কের মাঠে খেলা জমে উঠবে না। রেল লাইনের ধার ঘেঁয়ে চিনে বাদাম খেতে খেতে বেড়ানো হবে না। রিংকু আবার সেই জাহাজ দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠলো। জাহাজে চেপে এখন ওর পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। অনেক দূরে। যেখানে গেলে ফড়িং আর চড়ুই হাত বাড়িয়ে ধরা যায়।

এক সময় রিংকুর মনে হলো সেই জাহাজ এগিয়ে আসছে। ওই তো ধোয়া দেখা যাচ্ছে তারপর চিমনি, এক এক করে পুরোটা জাহাজ।

জাহাজ এগিয়ে আসছে।

সেই জাহাজটাই তো।

বাহ!

www.pathagar.com

রিংকুদের ঘাটে আসবেই লাফ মেরে জাহাজে উঠে পড়লো রিংকু। কেউ নেই। কি মজা, কি মজা।

ক্যাপটেনের পোষাক পরে আজম মামা জাহাজের কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন। রিংকু আনন্দে জড়িয়ে ধরলো মামাকে। ভোঁ ভোঁ সিটি বাজতে থাকলো। জাহাজটা এগোতে লাগলো। সাগরের ঢেউ তখন তীরে আছড়ে পড়ছে একের পর এক।

www.pathagar.com

সোনালী সকাল

আজ খুব ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠলো রাজু। এমনি এমনি উঠে গেছে, ঠিক তা নয়। আটটা নয়টা না হলেও প্রতদিন বেশ বেলা করে ঘুম থেকে ওঠে রাজু। আজ আব্বু ওকে সকাল সকাল ঠেলে জাগিয়ে তুললেন নামাজ থেকে ফিরেই। প্রতিদিন অবশ্য ঠেলেঠুলেই চলে যান। আর রাজু উঠি উঠি করে সেই কড়কড়ে রোদ পর্যন্ত ঘুমায়।

আব্বু রোজ সোবহান সাহেবের সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণ সেরে বাসায় ফেরেন কোনদিন আটটায় কোনদিন নয়টায়। সুতরাং রাজুকে ফিরে এসে পড়ার টেবিলে দেখে ফাঁকিঝুকির কথা ভাবতে পারেন না।

আজই অনেক দিন পর ব্যতিক্রম হলো।

আজ রাজুর মনে হচ্ছে জীবনে এই প্রথম-বার সে ভালো করে সকাল দেখছে। এই শহরের সকালটা কখন যে আসে আর কখন যে যায় টের পাওয়া যায় না। আসলে সকাল নামে কোন একটি ভালো লাগা সময় যে আছে, তা যেন একদম ভুলেই যাচ্ছিল সে।

সকাল, মানে ভোর। কাক ভোর। সূর্য যখনো ওঠেনি। হয়তো উঠি উঠি করছে। আলো আঁধারির সে এক অন্য রকম পৃথিবী। গাছগাছালী আর পাতার ফাঁকে ফাঁকে পাখি ডাকছে। বাড়ির আঙ্গিনায় মোরগগুলো কুককুরু কুক ডেকে ডেকে গলা ফাটাচ্ছে। চারদিক শান্ত নির্জন। একটা ঠান্ডা ছোঁয়া আমেজ যেন বকুল কিংবা হাস্নাহেনা ফুলের মিষ্টি ঘ্রান হয়ে সারাক্ষণ নাকে লেগে আছে।

www.pathagar.com

এক ফাঁকে মসজিদ থেকে নামাজ শেষে সবাই বের হয়ে এলেন। মোড়ল বাড়ির আবিদ মোড়ল লাঙ্গল কাঁধে গরু দুটি তাড়াতে তাড়াতে উত্তর দিকের পথ ধরে এই মাত্র আলো আঁধারীর জালে সেধিয়ে গেল। ভোর রাজুর কল্পনায় লবাইরকান্দি গ্রামের এমনি একটি সহজ সরল ছবি।

লবাইরকান্দি ওদের নিজেদের গ্রাম, দেশের বাড়ি। দাদা দাদীসহ সবাই থাকে যেখানে। রাজুরা অবশ্য শহরে থাকে। ওর জন্ম ও শহরে। ওদের গ্রামের অদ্ভুত নামটার কোন অর্থ সে খুঁজে পায়নি।

ওদের গাঁয়ের সে ছবি ছাড়া মনের ভেতর ভোরের অন্য কোন ছবি বানাতে পারে না রাজু।

সে গাঁয়ে এমনি এক সকালে জাহাঙ্গীর নামে গাঁয়েরই আরেকটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হয় রাজুর। সবাই ছেলেটিকে জাঙ্গী বলে ডাকতো। সেবার স্কুলে ছুটি না থাকলেও কি একটা কারণে আব্বা আম্মার সঙ্গে দেশের বাড়ী বেড়াতে এসেছিল সে।

মোহন কাকা জাঙ্গীর সঙ্গে রাজুকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "ওর নাম জাহাঙ্গীর। আমরা জাঙ্গী ডাকি, ক্লাস থ্রিতে পড়ে'। রাজুর চেয়ে বয়সে বেশ বড় হয়েও জাঙ্গী ছোট ক্লাসে পড়ে কেন এ-প্রশ্ন মনে আসলেও সেদিন থেকে জাঙ্গীকে ওর কেন জানি খুব ভালো লেগে-গিয়েছিল।

বড় দাদু পরে বলেছিলেন-'গ্রাম দেশতো, তাই ছেলেরো বড় হয়েও ছোট ক্লাসে পড়ে।'

যতদিন রাজু লবাইরকান্দি গ্রামে ছিল প্রত্যেকদিনই জাঙ্গী আর মোহন কাকাকে নিয়ে হাঁটতে যেত সে।

হাঁটতে হাঁটতে প্রতিদিন অনেক গল্প শোনাত জাঙ্গী। ঘুঘু পাখি, টুনিপাখি, ঘুটঘুটি সাপ আর অনেক জিনিস নিয়ে গল্প করতো জাঙ্গী। সে সব শুনে ওর মনে হতো তার শহরে থাকাটাই বৃথা, জাঙ্গী গ্রামে থেকে ছোট ক্লাশে পড়েও অনেক কিছু জানে।

ঘুঘু পাখি 'ঘুঘুক-ঘুক ঘুকঘু ঘুক' ডেকে কি বলে, শালিকরা ঝগড়া করার সময় কি বলা কওয়া করে, গেরস্তদের তাজা তাজা মোরগগুলো সেই কাক ভোরে ডেকে ডেকে গলা ফাটায় কেন-সব বলতে পারতো জাঙ্গী।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দুপুরে রাজুকে নিয়ে সে পাখীর বাসা খুঁজতে যেতো। কোন বাসায় কটা ডিম, কোন বাসায় কবে বাচ্চা ফুটেছে, চোখইবা ফুটবে কবে ইত্যাদি সবই জাঙ্গীর জানা।

জাঙ্গী বলতো 'রাজু মিয়া তুমি খালি নিচে খাড়াইয়া থাকবা, আমি পইকের ছাও পাইরা লইয়া আসমু'। রাজু তাই করতো।

রাজু উঠলো। বারান্দা পেরিয়ে বাইরে ভেজা ঘাসের চিকন ডগার উপর পা রাখলো। এখানে রাজুর নিজেকে অনেক হালকা মনে হচ্ছে। একদম হালকা। ইচ্ছে করলেই যেন সে পাখির মতো ডানা ঝটপটিয়ে উড়াল দিতে পারে।

রাজু দেখলো চড়ুইগুলো ভেন্টিলেটারের পাশ ঘেঁষে দেয়াল আর বেরিয়ে থাকা লোহার শিকের উপর বসে চেঁচামেঁচি শুরু করে দিয়েছে। পাখিগুলো ভেন্টিলেটারের ফোঁকর গলিয়ে ঘরের ভেতর হরদম যাওয়া-আসা করে। ওদের ডাকাডাকিতে রাজুর আম্মু প্রায়ই বিরক্ত হন। কিন্তু উপায় নেই, ওগুলো রোজ রোজই জ্বালাতন করে। মাঝে মাঝে রাজুর নিজেরও বিরক্তি ধরে যায়।

আজ চড়ুইগুলোর ডাক অন্য রকম লাগলো রাজুর। কেন জানি ভালো লাগছে খুব। ওর মনে হতে থাকে চড়ুইপাখিগুলো হল্লোড়-আনন্দ করছে। রাজু কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলো। একবার ওর মনে হলো, সে চড়ুই পাখি হয়ে যায়।

পা বাড়াল রাজু। ওদের বাসার পথটা ছেড়ে এক্ষুণি ও পাকা রাস্তায় পড়বে। একবার কি ভাবলো। তারপর সত্যি সত্যি বাড়ীর বাইরে গেলো সে।

সকালটা এখনো নির্জনতায় ডুবে আছে। আস্তে আস্তে আঁধার পাততাড়ি গুটিয়ে পালাচ্ছে। দূরে চায়নাদের আম বাগানে আরো কয়েকটি পাখির ডাক শুনলো সে। চায়নার আম্মা নামাজের জন্য অজু করছেন। পাখি কয়েকটা পাতার আড়ে থেকে শুধু ঝুপঝাপ লাফাচ্ছে আর ডাকছে। রাজুর আরেকবার পাখি হতে ইচ্ছে করলো। সুন্দর ডানাওলা পাখি। যেগুলো ঝটপটিয়ে ডানা মেলে দূর আকাশে ঘন্টার পর ঘন্টা উড়ে চলতে পারে।

www.pathagar.com

রাস্তায় চলতে চলতে এক সময় মনে হলো রাজু নিজে সত্যি সত্যি পাখি হয়ে গেছে। চারদিকে ফুরফুরে বাতাস। নিজেকে আরো হালকা মনে হচ্ছে রাজুর। মনে হচ্ছে এইতো সে উড়াল দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

এক সময় খানপুরের মাঠে পৌঁছে পরিচিত দু'একজনকে দেখে মনে হলো সে এখন আর পাখি নেই। কত লোক। কেউ হাঁটছে কেউ লাফাচ্ছে। সবাই বড় বড়, আব্বু আর বড় মামার মতো। এত বড় বড় মানুষেরা এমনি করে? দারুণ অবাক হলো রাজু।

অনেক ছোট ছোট ছেলে আছে। এক পাশে দেখলো রাজু। সবাই দৌড়-ঝাঁপে ব্যস্ত। ওর মনে হলো কি যেন হারিয়ে ফেলেছে ও। নিচে পড়তে ইচ্ছে করলো একবার। কিন্তু কাউকে তো চেনা বলে মনে হয় না।

ছেলেদের দলটিকে পাশে রেখে আরো এগুলো রাজু। বাসার কথা ভুলেই গেল। এক সময় রেল লাইনে গিয়ে উঠলো সে। এবার রাজু একেবারে থ।

দাদুর বয়েসী সব বুড়োরা তাদের মোটা পেট আর ভুড়ি নিয়ে টিডিং টিডিং লাফাচ্ছে আর দৌড়াচ্ছে। দৌড় রে দৌড়। এই বড় পেট নিয়ে এমনি দৌড়ান যায় ও মরে গেলেও কোন দিন কল্পনা করতে পারতো না। একবার রাজুর মনে হলো দু'একটা পেট এক্ষুণি এদিক ওদিক ছিটকে পড়বে।

এতক্ষণ হাসাহাসির কথা মনে হয়নি। হঠাৎ মনে হতেই দারুণভাবে হাসতে ইচ্ছে হলো তার। ইচ্ছে হলো হো হো হো হো হো হিহিহিহিহি হিহিহিহি করে হাসে। যে হাসি ঘন্টা তিনেকের আগে থামবেনা।

রেললাইনের পাশ ঘেষে নীচু ডোবামত পুকুরে কচুরির ফুল দেখলো রাজু। লবাইরকান্দি গ্রামে জাঙ্গী কচুরির ফুল জোগাড় করে দিত ওকে, মনে পড়লো। দূরের গ্রাম ও ধানের ক্ষেত দেখলো, সবুজে সোনায় একাকার হয়ে গেছে। তারই মতো একজন-কচি বালক, সাত সকালে ফুলের গাছে নিজের হাতে পানি দিচ্ছে। এদিকটায় এলে এমনি কেন জানি ভালো লাগে ওর। সারা প্রাণ খুশিতে আকুল হয়।

www.pathagar.com

রাজু রেল লাইন ধরে আরো এগিয়ে চললো। আস্তে আস্তে চানমারীর টিলার দিকে এগুতে থাকলো সে। বাসায় ফেরার কথা একদম ভুলে গেল।

এক সময় সামনে ওদের পাড়ার রুমী ভাইয়াকে দেখলো যেন রাজু। হ্যাঁ রুমী ভাইয়াইতো। একবার ভাবলো ডাক দেয়। তারপর সত্যি সত্যি রুমী ভাইয়া বলে জোরে কটি ডাক পাড়লো রাজু। না কোন সাড়া নই। রেল লাইনের কাঠে তালে তালে পা ফেলে পা ফেলে রুমী ভাইয়া দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এক সময় কষে দৌড় লাগিয়ে তাকে ধরার চিন্তা করলো লাজু। না কাজ হলোনা। রুমী ভাইয়াও দৌড় লাগিয়েছে জোরে।

পেছনে ক্রমশ লাল সোনালী সূর্য আসমানের পর্দা ফেড়ে বেরিয়ে আসছে। চারদিকে সোনালী সোনালী--- লাল আলো। রাজু একটু দাঁড়িয়ে থেকে দেখলো। এযেন নতুন কিছু দেখছে সে। প্রতিদিন আটটা নাগাদ আর ঘুমাবেনা মনে মনে ঠিক করে সে।

চানমারী টিলার কাছাকাছি পৌঁছে ঘাসের ওপর দপ করে বসলো সে। খানিক আগে ডানদিকে মোড় ফিরে রুমী ভাইয়া কোথায় গেল বুঝতে পারে না রাজু। ফুল ফসলের ক্ষেতে হয়তো বা সে হারিয়ে গেছে। আর তার চোখের সামনে ফুলের মতে ফুটছে আলোর আকাশ।

www.pathagar.com

রোদ

পাড়ার মোরগগুলোর যেন গরমও নেই শীতও নেই। সেই কাক ভোর থেকে বকবকানি শুরু হয়ে যায়।

পৌষের রুক্ষ দিনের শেষে রাস্তার ওপর এই দারুন শীতের মধ্যেও দু'তিনটি পরিবারকে রাত কাটাতে হয়। ভোর হয়ে আসতে চাষাড়ার সাহেবদের বাসায় খোয়াড় থেকে জোয়ান জোয়ান মোরগগুলো ডাকাডাকি শুরু করে দেয়।

ফেলু ওর মা, ভাই-বোনের সাথে আজ কয়েক মাস হলো শহরে এসেছে। ওরা আগে কালীপুরার গ্রামে থাকতো যখন-তখন ওদের কতো সাধই না ছিল শহর দেখবার। কে যেন বলেছিল-"টাউনে গেলে গাড়ি ঘোড়া আর দালান-কোঠা দেখন যায়।"

একবার ফেলু ওর মামার সাথে শহরে আসার জন্যে কি কান্নাটাই না কেঁদেছিল। কলেরা হয়ে ফেলুর বাবা মরার পর এক বছরেই দেখতে দেখতে ফেলুরা একদম ফতুর হয়ে যায়। তেমন কিছু অবশ্য আগেও ছিল না।

গ্রামে পাড়া প্রতিবেশীরা কতো আর দেবে? তাছাড়া যা দিনকাল-সবারই তো প্রায় একই অবস্থা। গ্রামে আজকাল ধার টার আর পাওয়া যায় না। চোখ দেখাদেখি মুখ দেখা-দেখি ভিক্ষায়ও বের হওয়া যায় না। ছানাপোনাসহ ফেলুর মা ফজিলতের নেছা বড়ই বেদিশায় পড়ে যায়।

শেষে একদিন শহরের পথে পা বাড়ায়। ফেলুরা সেই ই প্রথম লঞ্চ ষ্টিমার আর বাস-গাড়ি দেখে।

www.pathagar.com

শহরে এসে ফেলুরা কোন আশ্রয় পায় না। শেষমেষ ফরিদপুরের কইতরীর মা আর বরিশালের হুজ্জাবুড়োর সঙ্গে ওরাও রাম কৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সামনের প্রশস্ত সরকারী রাস্তার এক পাশে আশ্রয় নেয়।

তারপর থেকে ওখানেই ওদের কাটতে থাকে দিন এবং রাত।

ক্রমে ফেলু বাস-টেক্সী সব চিনে ফেলে। কইতরীর ছোটবোন টোকানী এবং হুজ্জা বুড়োর ছেলে গেদার সঙ্গে ফেলুর খাতির পরিচয় দিন দিন বাড়তে থাকে। ওরা পাড়া প্রতিবেশীর মত বেড়ে উঠতে থাকে।

চাষাঢ়ার সোনালী ব্যাংকের বারান্দা রাতের আবাস হিসেবে দু'তিন জন খবিশ মানুষের জন্য রিজার্ভ। ফেলুরা সেখানে ভিড়তেও পারে না।

ফেলু গেদা টোকানী ঐসব খবিশ মানুষগুলোকে একদম দেখতে পারেনা। বার বছরের ফেলু দশ এগার বছরের গেদা ওই খবিশ কেরামত কালু আর ছ্যাচড়া নবাবের সঙ্গে শক্তিতে পেরে উঠবেনা বলে তেমন কিছু বলতে পারে না।

টোকানীর তো কথাই নেই। ফেলু আর গেদার চেয়ে বয়সে বড় হলে কি হবে ওতো মাইয়া মানুষ।

সারাটা দিন ওদের রিক্সার পিছনে দৌড়িয়ে আর বড় রাস্তার পাড়ে ভাঙ্গা বাসে আড্ডা মেরে-খেলে কেটে যায়।

ভাঙ্গা বাসে বসে ফেলু গেদা আর টোকানী কুড়ানো সিগারেটের সুকা দিয়ে হাতে বানানো সিগারেট বিড়ি ফুঁকে। একদিন গেদা বলছিলঃ আমি বড় হইয়া যহন বাসের হেলপারের কাম লমু তগোরে আনাম আনাম ছিকরেট কিন্না দিমু, দেহিছ।

ফোস করে টোকানী বলেছিল-হ, যাইবার কইছে। তুই হবি গিয়া সামাল মিস্ত্রির রিক্সা গ্যারেজের ডেরাইবর-খাবি টোকাইন্না বিড়ি, আবার ছিকরেট ধরাবি কিরে?

ফেলু বলেছিল-টোকানী, দেখ অত দেমাগ ভালা না।

আমরা ভালা কাম পাইয়া যাইবারও পারি। কে কোন সুমে বাদশা আর ফকির হেইডা কি কেউ কইবার পারে?

টোকানী হে হে করে কতক্ষণ হেসেছিল। এরপর বলেছিল-বেশী প্যাচাল পারস কেন, দেখমুনে কেঠায় কেমুন কাম লইবার পারস।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গরমকালের দিনগুলোতে রাস্তার ওপর শুয়ে থাকতে ফেলু গেদাদের তেমন কোন কষ্টই হতো না। সেই মাঝ রাতে আসমানের চাঁদ আর তারা দেখতে দেখতে ওরা ইটের বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তো। ঘুম ভাংতো খুব ভোরে মোরগের ডাক আর আজানের শব্দে।

মাঝে মাঝে হুজ্জা বুড়ো রাজরাজরা আর ভূত-পেত্মীর কিসসা শোনাত। ফেলু ভেবেছে হুজ্জা বুড়ো কম করে হলেও একশ কিসসা জানে।

পৌষের দিন আসতে ক্রমশঃ শীত বাড়তে থাকে। সন্ধ্যা থেকে শুরু করে অল্প কিছু রাত হতেই ফেলুদের কুড়োনো কাগজে আর হাবিজাবি দিয়ে জ্বালানো আগুনের তেজ কমে যায়। এক সময় ছাইয়ের লাল আভাও মিলিয়ে যায়।

দুপুর রাতে শীতে হাত-পা যখন জমে যায় তখন এক মুঠো আগুন বা একটুকরো রোদের তাপের খুব বেশী দরকার হয়ে ওঠে ওদের কাছে। রাজ্যির সমস্ত শীত নেমে আসতে একদল লোক শীতে জড়াজড়ি করে ঠক ঠকিয়ে কাঁপতে থাকে।

কেউ কেউ মাঝে মাঝে একা একা বকবক করে- হায় আল্লা। খোদার দুনিয়া কেমুন জানি অইল। মাইনসের লাইগা মাইনসের দরদ নাই। এত বড় বড় টেহা-পসাঅলা লোক আছে টাউনে, একজনও তো আইয়া কইলনা-"তোমরা বহুত কষ্টে থাকতাছ। আহো, আমার ঘরের বারিন্দাডায় পইড়া থাক।"

বক্‌বকানী থামলে চিকন কান্না শোনা যায়। খানিকপর আবার সেই কণ্ঠ- বারিন্দায় হুইতে দিব দূরে থাউক কেউ না কইয়া উঠলেই হেট হুট কইরা ফালাইয়া দেয়। হায় আল্লা মাবুদ-তুমি অগো ট্যাহা-পসা সব কাইড়া নেও, সব কাইড়া নেও।

তারপর আবার হু হু কান্নার শব্দ। এ শব্দের সঙ্গে দূর থেকে সুর মিলায় রাস্তার নেড়ী কুত্তাগুলো।

মাঝে মাঝে ভেবেছে ফেলু। আসলে কি কেউ চাইলে ওদের এতটুকু উপকার করতে পারে না! কই কেউ তো আসে না। হেসে হেসে রোজ রোজ কত মানুষ, মেয়ে মানুষইতো রিক্সা গাড়ি করে পাশ দিয়ে যাচ্ছে - কেউতো আসে না?"

www.pathagar.com

ওই বড় লোকগুলোর ওপর চাপা আক্রোশ দিন দিন বাড়তে থাকে ফেলুর। মনে মনে ভাবে ওরা আমাদের শত্রু। আমরা ওদের বিনাশ চাই। এ সময় ফেলুর মুখের রং অন্য রকম হয়ে যায়। পেশী আর রগ গুলো ফুলে ওঠে। ফেলু বাজারে কুলির কাজ ধরেছে বেশ ক'দিন হলো। কি আর করবে। লোকের কাছে রোজ রোজ হাত পাতা যায়? একদিন ফেলু ওর রোজগারের পয়সা দিয়ে দুটো বড় ছালার বস্তা কিনে ফেলে। বড় শীত। রাতে ও নিজে এর একটাতে ঢুকে হাটুভাঙ্গা 'দ' হয়ে শুয়ে থাকে। এভাবে কোন কোন দিন সেই বেলা ওঠা পর্যন্ত ঘুম পাড়ে ফেলু।

টোকানীর আজ আজান দেয়ার সাথে সাথে ভোররাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। মোরগগুলো তখন ডেকে ডেকে গলা ফাটাচ্ছিল। পুব আকাশে আবছা আলো। একটি দিনের প্রত্যাশায় সমস্তটা পৃথিবী।

একটু পর আলো ফুটবে। রাস্তায় শোয়া ভুক্ষা নাঙ্গা মানুষগুলো উঠতে শুরু করে। কেউ কেউ ইটের ফাঁকে টায়ারে আগুন ধরিয়ে জাউ রাধতে লেগে যায়। পুরনো কম্বলটায় মাথা-নাক-কান ঢেকে আবার বাঁকা হয়ে শুয়ে পড়ে। আজ রোদ না উঠতে আর নড়চড় করা যাবে না।

এক সময় বিকট হুইসেল বাজিয়ে ভোরের ট্রেনটা চাষাড়া ষ্টেশন ছেড়ে যায়। টোকানী কম্বল ঠেলে উঠে পড়ে। রাস্তার অপর পাড়ে কলের পানিতে অনেক কষ্টে মুখ হাত ভিজায়। এর পর টোকানী গেদা এবং ফেলুর খোঁজ করতে থাকে।

টোকানী অদূরেই বস্তা-বন্দী ফেলু আর গেদাকে খুঁজে পায়। ওদের তখনো ঘুম ভাঙেনি।

টোকানী ওদের ঠেলে ঠেলে জাগানোর চেষ্টা করে- এই ফালাইন্যা ওঠ, ওঠ, অই দেখ রইদ ওঠছে। ফেলু ছালা থেকে মুখ বের করে পিট পিট করে তাকায়।

টোকানী আবার গেদুকে ডাকতে থাকে-অই গেন্দু অই গেন্দা ওঠ ওঠ রইদ ওঠছে। জলদি উইঠা পড় আইজকা ভালা কইরা রইদ পোয়ামু।

www.pathagar.com

আবু টিটুর পাখি শিকার

বাবুল ভাইজানের এয়ার গান নিয়ে টিটু আর আবু পাখি শিকারে যাবে। আজই। জাল কুড়ির বনে যাবে ঠিক করে রেখেছে দু'দিন আগেই।

পাখি মানে ঝগড়া বিশারদ চড়ুই আর খ্যাশখ্যাশে গলার শালিক। চান্দু নানা তাইতো বলছিলেন সেদিন। নানা বলছিলেন-নানাভাই কি আর কমু, চইরকা আর হালিক দিনডা ভইরা খ্যাচ খ্যাচ কইরা কাইজ্যা করে।

একথা শোনার পরপরই আবু আর টিটু পাখি শিকারের জন্যে মনে প্রাণে তৈরী হয়ে যায়।

আবুর ছোট ভাই কেমন করে যেন এ ব্যাপারে শুনতে পেরে টিটুকে বলেছিল-তিতু ভাই তিতু ভাই বন্দুক বন্দুক, লাইফেল। বন্দুক লাইফেল নিয়ে আমিও তোমাদেল সাথে যাবো।

বাবু 'র' কে 'ল' আর 'ট'কে 'ত' বলে। এ নিয়ে আবু আর হাসি বুবু দিন ভর ওকে ক্ষেপায়।

টিটু কিছু বলার আগে আবু ওর গালে একটা সিকি পাউন্ড ওজনের ড্যাস মেরে বলেছিল-ভালো ভালো, তোমাকে ছালা গিয়ে আমলা বাঘের মুখে পলবো নাকি?

বাবু তার পর হদ্দ বোকার মত হে হে করে হেসেছিল। ওর সে হাসি ছিল পরম বিশ্বাসের।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আগে দিন কতক এক নাগাড়ে রেল লাইনের ধার ঘেঁষে ঘুর ঘুর করে বেড়িয়েছে আবু আর টিটু। হাতে ছিল গুলতি আর পোড়া মাটির গোলা। লক্ষ্য ছিল মাদার গাছে ফুরুত ফারুত উড়ে বেড়ানো শালিক আর চড়ুই। ঘুর ঘুর করেছে অনেকদিন একটা পাখির পালকও খসাতে পারেনি।

বাবুল ভাইজান জানুয়ারীতে লেখাপড়ার জন্যে রাজশাহী চলে গেলেন। তার পর থেকে এয়ার গানটা এখন আবুর দখলে। পুরোপুরি না হলেও অন্ততঃ কিছুদিন এ নিয়ে খেলানো যাবে ভেবেছিল আবু।

গুলি যোগাড়ের একটা বড় সমস্যা ছিল। চান্দু নানার মাধ্যমে ওর আর টিটুর জমানো পয়সাতে তা কদিন আগেই কেটেছে।

সব ঝামেলা শেষ। কে আর রুখবে তাদের? আবু অনেকক্ষণ ধরে পড়েও ভুগোল পড়াটা মুখস্ত করতে পারলো না। বার বার জানলায় চোখ গেলে কি তার পড়া হয়। আবুর অপেক্ষায় কখন থেকে জানলায় চোখ রাখতে শুরু করেছে টিটু। বার বার ফাঁক খেলো।

বাবু হাসি বুবুর সঙ্গে রুপো খালার বাসায় গেছে। ফাঁকতালে বাইরে বেরুবার এমন মোক্ষম সময় কি সব সময় আসে।

ঠিক দশটায় টেকো বিল্লালকে নিয়ে টিটুর আবুদের বাসায় চলে আসার কথা। একদম রেডি হয়ে। আবু সেই কখন থেকে বই হাতে জানলায় চোখ রেখে বসে আছে। সব রেডি হলেই আল্লাহর নাম করে বেরিয়ে যাওয়া চলবে।

ভালোছাত্রগিরি ফোটানোর চেষ্টায় আবু খুবই পোক্ত। সেই সকাল থেকে নাকের ডগায় ভুগোল বইটা গেঁথেই নিয়েছে যেন। কিন্তু বইতে পড়াগুলো আর পড়া থাকে না। কালো কালো অক্ষর শালিক আর চড়ুই হয়ে চোখের সামনে ছুটাছুটি করে, লাফায়। কখনো বা উড়াল দিয়ে পালিয়ে যেতে চায়। কেন এমন হয় আবু বুঝতে পারে না।

www.pathagar.com

আবু ভাবে, মা মনি নিশ্চয় ভাবছে-সোনার চান ছেলে আমার। আহারে সেই সকাল থেকে লেখাপড়া করছে?

আবুর রাগ হলো এক সময়। ওই টেকো বিল্লালটাকে সাথে নিতে গিয়েই বোধহয় ঝামেলাটা...। বিল্লালকে সাথে নেয়ার প্রস্তাব দিতেই আবু বলেছিল-দেখ, ওই বেলা মাথা টেকো, ফেকো বাদ দে। নাইলে দেখবি কু সাইধ লাগবে।

টিটু শুনলো না তখোন।

আবুর রাগ বাড়তে থাকে। টিটুকে চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে- কেমন হলো টিটু মিয়া, শিকারে গেলে না? আবুর ইচ্ছে করছে এয়ার গানের বাট দিয়ে টিটুকে দুখান লাগিয়ে বলে-তুই নষ্টের গোড়া। ওই ছোলা মাতা বিলাইটাকে কেন সাথে নেয়ার বায়না ধরলি।

আসলে বিল্লালের কোন দোষ নেই। এমনিতে খুব খাটতে পারে ছেলেটা। আর টিটুর খুব ভক্ত। কিছু কাজ টাজ-মানে পাখি গুলি খেয়ে উড়ান দিয়ে কাঁটা ঝোপে পালালে টালালে ধরে আনা ইত্যাকার নানান ঝক্কি সামাল দেয়ার জন্যেই বিল্লালকে সাথে নেয়ার কথা বলেছিল টিটু।

এসব ব্যাপার বিল্লাল মোটেও জানতোনা। আর ওর বাবা মা প্রায় জোর করে ধরেই ওর মাথাটা ন্যাড়া করে দিয়েছে। বিভিন্ন কারণে দুতিন দিন বিল্লাল ন্যাড়া মাথা নিয়ে ঘর থেকেই বেরোয়নি।

আরো কয়েক মিনিট কাটলো। কাল রহমান স্যারের ভুগোল ক্লাশ। রহমান স্যার অল্প অল্প পড়া দেন। কিন্তু নেন ঝরঝরে মুখস্ত। দু'এক জায়গায় একটু ছুটে গেলো তো ঠাস ঠাস ডাষ্টারের বাড়ি পড়বে হাতের তালুতে।

www.pathagar.com

হাতের তালু কোন দিন পড়া মুখস্ত রাখতে পারে না। যে পারে তার নাম মগজ বা ঘিলু। ঘিলু রেখে রহমান স্যার কেন যে খামাখা হাতটাকে কষ্ট দেন আবু কোনদিন ভেবে পায়নি।

রহমান স্যারের মুখ আর হাতে ধরা ডাষ্টার ভাসলো আবুর চোখে। আবু বইয়ে একটু ভাল করে মন ডুবাতে চেষ্টা করে।

একসময় বাইরে খটাশ খটাশ শব্দ হয়। কে যেন বারান্দায় উঠে এসেছে মনে হলো আবুর। আবু মুখ তুলে জানলা বরাবর তাকালো। একজন মহিলা রুপো খালার মতো, দুপায়ের নিচে মস্ত দুখন্ড গাছের গুড়ি মানে হাইহিল ফেলে দিয়ে দিব্যি হেঁটে আসছেন। মহিলাকে চিনতে চেষ্টা করে আবু পারে না। তিনি জিজ্ঞেস করেন-এটা ডাক্তার রহমান সাহেবের বাসাতো।

-হ্যা। বইটা বন্ধ করে আবু। আপনি কাকে চান।

-ডাক্তার সাহেব কি হন তোমার? উনি বাসায় আছেন?

মহিলার প্রশ্নের জবাব ঠিকঠিক দিয়ে ফিরে যায় আবু। ডাক্তার সাহেব বাসায় নেই জেনে মহিলা একসময় বিদায় হন।

মহিলা যেমনই হোক তার হাইহিল জোড়া আবুর চোখে ভাসতে থাকে। হাইহিল জোড়াকে জায়ন্ট হাইহিল বলে মনে হয় আবুর।

ওর আব্বু এসময়টা সাধারণত অফিসে মানে হাসপাতালে থাকেন। রোগী টোগী তেমন আসে না এই দুপুর সময়ে।

মহিলা চলে যেতে একজন হাফ লোফ এলেন। আবু ভাবলো মানুষ এতো রোগা পাতলা হয়। রফি মামা অসুখে পড়ে একবার সময় কাকলাসের মত হয়ে ছিলেন তখন তাকে হাফ মানুষ হাফ মানুষ লাগতো। ডাক্তার সাব বাসায় নেই জেনে লোকটা চলেও গেলেন। তাকে আবুর গ্যাষ্ট্রিক আর পেট ব্যথার রোগী বলে মনে হলো।

www.pathagar.com

সেই হাফ মানুষটি যেতে দশ মিনিটও হয়নি। পর পর কয়েকজন ডাক্তার সাহেবকে খুঁজলেন। আবু একবার দরজা বন্ধ করে একবার খোলে। আবুর রাগ ধরে যায় এক সময়।

এদিকে টিটু কি টেকো কারো যেমন পাত্তা নেই। পুরো পরিকল্পনাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আবুর খুব খারাপ লাগতে থাকে। ওর মাথাটা গরম গরম লাগে। ডাক্তার সাহেবরে খোঁজে আরো লোক এলেন। আবু শেষে একদম হয়রান হয়ে পড়ে। একসময় ওর মাথা ঘুরতে থাকে। জালকুড়ির বন, শালিক চড়ুই, ভুগোল ক্লাশ, রহমান স্যার, টিটু টেকো সব একসাথে দেখতে থাকে।

আবু আস্তে করে ফ্যান ছাড়ে। মাথায় পানি ঢালতে গিয়ে গ্লাস পড়ে যায় হাত থেকে। আম্মু পাকঘর থেকে কি ভাংলিরে-করে দৌড়ে আসেন। চুলোয় তরকারীর ফোসফোসানীতে আবার চলেও যান।

আবু ভাঙ্গা গ্লাশের টুকরার মধ্য দিযে আসন্ন বিপদের ছবি দেখতে পায়।

একসময় মাথাটা সামান্য ঠান্ডা হয় আবুর। আবু দরজার ছিটকিনি আর আড়াআড়ি লাগানোর কাঠটা লাগায়।

একটু পর সোজা ছাদে উঠে যায় আবু।

www.pathagar.com

Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড

চট্টগ্রাম অফিসঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস ঃ ১২৫, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

www.pathagar.com